সুশাসনের জন্য রাজনীতি

ইঞ্জিনিয়ার নাঈম হাসান

আমাদের দেশে আজকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সুশাসন। বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্যেও শুধুমাত্র সুশাসনের অভাবে আমরা উন্নতির কাংক্ষিত লক্ষে পৌছতে পরছি না। সর্বগ্রাসী দুর্নীতি আমাদের সব অর্জনকে ব্যার্থ করে দিচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থার কারণ কি? আর এ'থেকে মুক্তির উপায়ই বা কি? কি ভাবে আমরা সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারি? শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতারাই কি এ'জন্য দায়ী ? নাকি পদ্ধতিগত কোন ত্রুটিও এর পিছনে কাজ করছে?

আমরা জানি, সরকারের দুটি অংশ-রাজনৈতিক এবং প্রশাষনিক। এর মধ্যে রাজনৈতিক অংশটিই দেশের মালিক তথা জনগনের প্রতিনিধিত্ব করে, আর প্রশাষন হচ্ছে রাস্ট্রের কর্মচারী (বা কর্মকর্তা!)। এখন মালিক যদি দুর্নীতিবাজ হয়, রাস্ট্রীয় সম্পদ চুরি করে তাহলে কর্মচারীর কাছ থেকে আপনি সততা আশা করবেন কিভাবে? কাজেই সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম প্রয়োজন রাজনৈতিক নেতাদের দক্ষ, সৎ ও দেশপ্রেমিক হওয়া। কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? বর্তমান নেতাদের চরিত্র ঠিক করা নিঃসন্দেহে একটা ভাল (কিন্তু কঠিনতম) সমাধাণ, এ'ছাড়া আর কোন উপায় কি নেই? এখানে এ'সব প্রশ্নের উত্তর খোজার পাশাপাশি একটি যুগউপযোগী গনতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থার কথা উপস্থাপন করা হয়েছে যা আমাদের রাজনৈতিক পরিবেশের বৈপ্লবিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে অসৎ, দুর্নীতিবাজ, কাল টাকার মালিকদের পরিবর্তে সৎ, দেশপ্রেমিক, দক্ষ ও সাধারনভাবে সবার কাছে সর্বাধিক গ্রহনযোগ্য নেতাদের ক্ষমতায় আসার পথ সুগম করবে ।

গনতন্ত্র : আমরা রাজতন্ত্রের কথা জানি । রাজন্ত্রে বলা হয় দেশের মালিক হচ্ছেন রাজা। এবং তিনিই তার রাজত্ব পরিচালনা করেন। যেহেতু রাজাই মালিক এবং পরিচালক সেহেতু তাকে কার কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। আর গনতন্ত্রে দেশ ও দেশের সম্পদের মালিকানা দেয়া হয়েছে জনগনকে। যেহেতু কোটি কোটি মালিকের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহন করা সম্ভব নয় তাই এই মালিকদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত, সবচেয়ে যোগ্য দল ও ব্যাক্তিদের উপর দেশ পরিচালনার দায়িত্ব একটি নির্দিস্ট সময়ের জন্য অর্পন করা হয়। নির্দিস্ট সময় পর পর মালিকের কাছে জবাবদিহি করার জন্য নেতাদেরকে ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এখানে বিশ্বাস করা হয় যে অধিকাংশ মালিকের পক্ষে একত্রে ভুল করা সম্ভব নয়। কাজেই যে দল বা ব্যাক্তি নির্বাচিত হয়েছেন তিনিই বা সেই দলই মালিকদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য এবং তার উপর দেশ পরিচালনার দ্বয়িত্ব দেয়াই সবচেয়ে মঙ্গলজনক। আমার কাছে সহজ কথায় এই হচ্ছে গনতান্ত্রিক ব্যাবস্থার মুল বক্তব্য।

নির্বাচন : এই গনতান্ত্রিক ব্যাবস্থায় নির্বাচনের গুরুত্ব সর্বাধিক। নির্বাচন যদি সঠিক না হয় এবং জনগন যদি বিশ্বাস করতে না পারে যে তাদের মধ্যকার সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তিই তাদের পরিচালনা করছেন তাহলে গনতন্ত্র কখনই কাংক্ষিত সুফল বয়ে আনতে পরে না। মানুষ যদি তাদের নেতাকে সর্বাধিক যোগ্যই মনে না করে তাহলে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার প্রতি শ্রদ্ধা বা আন্তরিকতা কোথা থেকে আসবে?

বর্তমান ব্যাবস্থা: বর্তমান নির্বাচন ব্যাবস্থার সবচেয়ে বড় যে ত্রুটি আমাদের বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিবিদরা চিহ্নিত করেছেন এবং যার জন্য তত্বাবধায়ক সরকারের আবির্ভাব ও আজকের সংস্কার বিতর্ক তা হচ্ছে, সরকার বা প্রশাষনের পক্ষপাতিত্ব। এ'ছাড়া কাল টাকা, পেশীশক্তির ব্যাবহার, সন্ত্রাস, ধর্মীয় অনুভুতির ব্যাবহার ইত্যাদিকে বিগত তিনটি নির্বাচনের অন্যতম প্রধান কলঙ্ক হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু আমার মতে এ'সব হচ্ছে বিষবৃক্ষের ডাল-পালা, ফুল-ফল অর্থাৎ দৃশ্যমান অংশ। এই নির্বাচন ব্যাবস্থার মুল দুর্বলতা রয়েছে অন্য যায়গায়। এই ব্যাবস্থায় সত্যিকারের নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকরার এবং কাল টাকা, সন্ত্রাস ও ধর্মীয় অনুভুতির ব্যাবহার মুক্ত পরিবেশ দিলেই গনতন্ত্রের মুল দাবি অনুযায়ী সর্বাধিক যোগ্য ব্যাক্তি ও দল নির্বাচিত হয়ে আসতে পারবে কি? আমার মতে পারবে না। কেন, তার প্রধান কয়েকটি কারণ এখানে উল্লেখ করছি।

একটু চিন্তা করে বলুন তো, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একজন ভোটার কাকে ভোট দেয়, বা দেয়া উচিৎ ? দলকে না ব্যাক্তিকে ? বর্তমানে একই সাথে ব্যাক্তি দলীয় প্রতীক ও মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়। তাই তাদেরকে আলাদা করে দেখার কোন উপায় নেই। কিন্তু দেশ পরিচালনা করে দল, ব্যাক্তি নয়। বর্তমানে তো দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে গেলে ব্যাক্তির সদস্য পদই বাতিল হয়ে যায়। কাজেই ব্যাক্তি নয় বরং দলের ভাল মন্দই বিবেচনায় আনা উচিৎ, অর্থাৎ সবচেয়ে ভাল দলকেই ভোট দেয়া উচিৎ। কিন্তু ব্যাক্তি যদি খারাপ বা অযোগ্য হয়, তাহলে তাদের নিয়ে গড়া দল ভাল ও যোগ্য হবে কি করে ? এ'ধরনের জটিল অবস্থায় একই সাথে সর্বাধিক ভাল দল ও ব্যাক্তিকে ভোট দেয়া প্রায় অসম্ভব। যদি এ'দুয়ের দুর্লভ সম্মিলন পাওয়া যায় তবুও যে তাকে ভোট দেয়া যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। দলের আদর্শ, কর্মনীতি খুবই ভাল, দেশের জন্য মঙ্গলজনক এবং মনোনিত প্রার্থি সর্বাধিক যোগ্য হলেও তকে ভোট দেয়া মানে ভোট নস্ট (!) করাও হতে পারে যদি তার বিজয়ের কোন সম্ভাবনা না থাকে। আর সে একা বিজয়ী হলেও হবে না, দলকেও ক্ষমতায় যেতে হবে। এলাকার উন্নয়নের জন্য সরকারদলীয় এম.পি, মিনিস্টার থাকা জরুরি। কাজেই বর্তমানে সর্বাধিক যোগ্য দল

ও ব্যাক্তির পরিবর্তে সম্ভাব্য বিজয়ী প্রার্থিকে ভোট দেয়া প্রায় বাধ্যতামুলক এবং এর অনিবার্য পরিনতি বহুদল বহুমতের পরিবর্তে সংকীর্ণ দ্বিদলীয় শাষনের প্রবর্তন যেমন হয়েছে আমেরিকাসহ অধিকাংশ পশ্চিমা দেশে।

এখানে একটা কঠীন দুস্টচক্র তৈরী হয়েছে - নির্বাচনে জেতার জন্য চাই অঢেল সম্পদ - দুর্নিতিবাজ ও কালটাকার মালিকরাই এই টাকা বিনিয়োগের ক্ষমতা রাখে - দল ক্ষমতায় যাওয়ার প্রয়োজনে এদেরই মনোনয়ন দিতে বাধ্য হয় - টাকার জোরে এম.পি মিনিস্টার হয়ে দুর্নীতির মাধ্যমে এরা আরো বেশী কাল টাকা সঞ্চয় করে । এই দুস্টচক্র ভাংতে না পারলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নির্মুল করা কখনই সম্ভ নয়।

এই নির্বাচন ব্যাবস্থা আমাদের দিয়েছে সংখ্যা গুরুর উপর সংখ্যা লঘুর শাষন, যা গনতান্ত্রিক চেতনার সম্পুর্ণ বিপরীত। '৯১ এবং '৯৬ এ নির্বাচিত শাষক দলের প্রতি সমর্থন ছিল ৩৫ ভাগেরও কম মানুষের। এবার সমর্থন ৪৮ ভাগ হলেও ক্ষমতা উঠেগেছে শত ভাগে। এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগনের অনাস্থায় গঠিত সরকার কখনই স্থিতিশীল ও কল্যানকর হতে পারে কি?

এর পর আছে ভোটারদের মর্যাদগত তারতম্য। রাজধানী ঢাকাসহ শহরাঞ্চলের অনেক আসনে লক্ষাধিক ভোট পেয়েও অনেক প্রার্থী পরাজিত হন, আর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৪০-৫০ হাজার ভোট পেয়েই অনেকে নির্বাচিত হয়ে যান। যে নির্বচন ব্যাবস্থায় শহরাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত অধিক সচেতন, শিক্ষিত, অগ্রসর লক্ষাধিক ভোটারের মতামতের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর কম সচেতন ৪০-৫০ হাজার গ্রামীন ভোটারের মতামতের মূল্য বেশী তা কিভাবে দেশের জন্য কল্যানকর হতে পারে ? এ'ধরনের বৈষম্য একদিকে যেমন ক্ষোভের জন্ম দেয় অন্যদিকে তেমনি অযোগ্যদের ক্ষমতা হরনের পথ সুগম করে।

কাজেই আমাদেরকে যদি সত্যিকার অর্থে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের মালিক জনগনের সত্যিকারের প্রতিনিধি, দেশের সর্বাধিক যোগ্য দল ও ব্যাক্তিকে দেশ পরিচালনার দ্বায়িত্ব দিয়ে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে এই প্রচলিত নির্বাচন ব্যাবস্থা বাতিল করে সম্পুর্ণ নতুন যুগউপযোগী ব্যাবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

আমাদের প্রস্তাবনা : আমি যে নতুন নির্বাচন পদ্ধতির কথা বলছি তাতে দল ও ব্যাক্তিকে আলাদা আলাদা ভাবে ভোট যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। প্রথম নির্বাচন হবে দল ভিত্তিক, দ্বীতিয় নির্বাচন হবে প্রার্থী ভিত্তিক। কারণ বর্তমান ব্যাবস্থার তত্বগত প্রধান ত্রুটি হচ্ছে দল ও ব্যাক্তির একই সাথে নির্বাচনে অংশ নেয়া। এবং এই তাত্বিক ত্রুটি থেকেই অন্যসব ব্যাবহারিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। এতে ভোটারগন যেমন বিভ্রান্ত হন তেমনি নির্বাচনী উত্তেজনাও থাকে বহুমাত্রিক। ব্যাক্তি ও দল উভয়ের জন্য নির্বাচনে জয় পরাজয় রাজনীতির ময়দানে বাঁচা মরার প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয়। ফলে ব্যাক্তি যেমন বৈধ অবৈধ যেকোন উপায়ে বিজয়ী হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেস্টা করে দলও তেমনি এমন প্রার্থিকেই মনোনয়ন দিতে বাধ্য হয় যে জিতে আসতে পারবে। ব্যাক্তি ও দলকে আলাদা করে দিলে নির্বাচনী উত্তেজনা হ্রাসসহ অনেক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে।

প্রথম পর্যায়ের দল ভিত্তিক নির্বাচনে কোন প্রার্থি থাকবে না। জাতীয় ও সর্বদেশীয় দলগুলো নিজ নিজ দলীয় প্রতীক নিয়ে এই নির্বাচনে অংশ নেব। দেশব্যাপি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে অংশ গ্রহনকারী দলগুলো প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার অনুসারে পুর্ণসংখ্যায় সংসদে আসন লাভ করবে। তবে ১% এর নিচে ভোট প্রাপ্ত কোন দলকে সংসদে প্রতিনিধিত্ব দেয়া হবে না।

স্বতন্ত্র প্রার্থিরা এই পর্যায়ের নির্বাচনে অংশ নেবেন। তাদের বিজয়ের জন্য প্রয়োজন হবে মোট ভোটের ০.৩৩% ভোট। দেশের ৬ কোটি ভোটারের ৬৫% ভোট দিলে এই সংখাটা হবে ১,২৮,৭০০। এই সংখ্যক ভোট পাওয়ার জন্য একজন স্বতন্ত্র প্রার্থিকে ২/৩টি নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রতিদ্বন্দিতা করার সুযোগ দেয়া হবে। এবং সর্বাধিক ভোট প্রাপ্ত আসন থেকে নির্বাচিত ঘোষনা করা হবে (যদি মোট ভোট ০.৩৩% বা তার বেশী হয়)।

প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে আসন বন্টনের পরে (১)দলীয় ভোটের অতিরিক্ত ভগ্নাংশ, (২) ১% এর কম দলীয় ভোট, (৩) ০.৩৩% এর কম পাওয়া পরাজিত স্বন্ত্র প্রার্থির ভোট এবং (৪) ০.৩৩% এর অতিরিক্ত বিজয়ী স্বন্ত্র প্রার্থির ভোট মিলে কিছু সংখ্যক আসন অবন্টিত থেকে যাবে। এই আসনগুলো থাকবে প্রেসিডেন্টের হাতে। তিনি যে দলকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানাবেন তাকে এই আসনগুলো দেবেন, যা সরকারের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করবে। কারণ এ'ধরনের নির্বাচনে কোন দলের একক ভাবে ৫০% এর অধিক আসন পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাক্তিকেন্দ্রিক নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকা নির্দিস্ট করা হবে। দেশের মোট নির্বাচনী এলাকা হবে ১৫০ টি এবং তা নির্ধারিত হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে । এই এলাকাগুলো সরকারী দল বা জোটের মধ্যে এবং বিরোধী দলগুলোর মধ্যে আলাদা ভাবে বন্টন করা হবে। ফলে প্রত্যেক এলাকা একই সাথে একটি সরকারী দল ও একটি বিরোধী

দলের ভাগে পড়বে। এই ব্যাবস্থা এজন্য যে আমরা চাই দেশের সকল এলাকায় সরকারী ও বিরোধী উভয় জোটের প্রতিনিধি থাকুক। চেস্টা করতে হবে যে দল যে এলাকায় অধিক ভোট পেয়েছে তাকে সেই এলাকার প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেয়ার। তবে সকল ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নাও হতে পারে। কোন দল সারা দেশে ২% ভোট পেলে এবং কোন এলাকায় ১০% এর বেশি ভোট না পেলেও তাকে ৬ টি এলাকা দিতে হবে। এক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে আসতে হবে। যেহেতু সরকারী ও বিরোধী দলগুলো আলাদাভাবে নিজেদের মধ্যে আসন বন্টন করবে সেহেতু এই সমাধান তেমন জটিল হবে না ।

সরকারী ও বিরোধী উভয় শ্রেনীর দলগুলো তাদের ভাগে প্রাপ্ত নির্বাচনী এলাকায় কমপক্ষে তিনজন প্রার্থী নিয়ে নিজ নিজ প্যানেল ঘোষনা করবে। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় দুটি করে প্যানেল হবে এবং প্রত্যেক ভোটার তার এলাকার সরকারী প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য একটি এবং বিরোধী দলীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য আর একটি ভোট দেবে। এভাবে দেশের সকল নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন সরকার দলীয় সদস্য পাওয়া যাবে যিনি এলাকার উন্নয়ন ও সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কাজ করবেন এবং একজন বিরোধী দলীয় সদস্য পাওয়া যাবে যিনি সরকার দলীয় সদস্যের কাজের ভুলত্রুটি শুধরেদেয়াসহ সব ধরনের সহযোগীতা করবেন।

একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে। সরকারী দলগুলো সম্মিলিত ভাবে ১৫০ এর অধিক এবং বিরোধী দলগুলো সমসংখ্যক আসন কম পাবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য যেসকল এলাকায় সরকারী দলগুলো সম্মিলিত ভাবে সর্বাধিক ভোট পাবে সেসব এলাকায় তারা একক প্যানেলে নির্বাচন করবে। এই প্যানেলে প্রার্থী সংখ্যা হবে কমপক্ষে ৬ জন। প্রথম এবং দ্বীতিয় স্থান অধিকারী দুজন বিজয়ী হিসেবে সংসদে যোগ দেবেন। তাছাড়া যেসব এলাকা থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থি প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন সেসব এলাকায়ও প্যানেল হবে একটি। বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থী যে পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করবেন, তার বিপরীত পক্ষকে নির্বাচনে অংশ নিতে হবে।

একটি উদাহরণ : ধরি কোন এক নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে ক দল (বা জোট) মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৪২.৭৮% পেল। খ দল পেল ৩৪.৬০%, গ দল ১৪.২৫% ঘ দল ৬.১৩%, একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী (ধরি স্ব-১) ০.৪৮% , আর একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী (ধরি স্ব-২) ০.৩৫% এবং অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলে ১.৪১% ভোট পেল। তাহলে ক দলের আসন হবে প্রতি ১% এর জন্য ৩ টি হিসেবে ৪২% এর জন্য ৪২ × ৩ = ১২৬ টি এবং ০.৭৮ % এর জন্য আরো ২ টি (০.৩৩% এর জন্য একটি হিসেবে) মোট ১২৮ টি। একই ভাবে খ দলের আসন হবে ১০৩ টি, গ দলের ৪২ টি এবং ঘ দলের ১৮ টি। দুই জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট নির্বাচিত আসন হবে ২৯১ টি। অবন্টিত ৯ টি আসন থাকবে প্রেসিডেন্টের হাতে। সর্বাধিক আসন প্রাপ্ত ক দলকে যখন তিনি সরকার গঠনের আহ্বান জানাবেন তখন এই ৯ টি আসন তাদেরকে দিবেন। ফলে তাদের আসন সংখ্যা হবে ১৩৫ টি। যদি তারা সরকার গঠনে সক্ষম না হয় তাহলে খ দলকে আহ্বান জানাবেন এবং তাদেরকে ঐ ৯ আসন দিবেন । ধরাযাক ক দল, ঘ দল এবং স্ব-১ এর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করল (মোট আসন ১২৬+৯+১৮+১ = ১৫৪ টি)। দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে দেশকে ১৫০ টি নির্বাচনী এলাকায় ভাগ করা হবে। দু'জন স্বতন্ত্র প্রার্থী দুই এলাকায় স্ব-১ সরকারী এবং স্ব-২ বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব করবেন। ফলে ঐ দুই এলাকায় প্রার্থী ভিত্তিক প্যাণেল হবে একটি। স্ব-১ এর এলাকায় বিরোধী দল তাদের প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচন করবে আর স্ব-২ এর এলাকায় সরকারী দল তাদের প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচন করবে। ক দল ১৩৫ টি এলাকায় এবং ঘ দল ১৮ টি এলাকায় সরকারী পক্ষে নির্বাচন করবে। খ দল ১০৩ টি এবং গ দল ৪২ টি এলাকায় বিরোধী পক্ষে নির্বাচন করবে। সরকারী পক্ষ ১৫০ এর চেয়ে ৪ টি আসন বেশী পেয়েছে। ফলে ৪ টি এলাকা থেকে দুজন প্রতিনিধিই হবেন সরকার পক্ষের। এই এলাকাগুলি হবে ক, ঘ এবং স্ব-১ মিলে সর্বাধিক ভোট পাওয়া প্রথম ৪ টি এলাকা ।

এই নতুন নির্বাচন ব্যাবস্থার ভাল-মন্দ দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনার জন্য আমি দেশের বিশিস্ট বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদ, ও সচেতন সুশীল সমাজের প্রতি বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। আমি যে আইন প্রনয়নের প্রস্তাব করলাম তার মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। পর্যাপ্ত আলোচনা পর্যালোচনা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমেই একটি সঠিক ও ফলপ্রসু ব্যাবস্থা গড়ে উঠা সম্ভব। তবে আমার দৃস্টিতে এই ব্যাবস্থার যুগান্তকারী কিছু সুফল এখানে উল্লেখ করছি।

১. দল ও ব্যাক্তি কেন্দ্রিক নির্বাচন আলাদা ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ায় উভয় নির্বাচনেই উত্তেজনা ব্যাপক হারে হ্রাস পাবে। ফলে সন্ত্রাস, ব্যালট ছিনতাই, প্রতিপক্ষের উপর হামলা, জালভোট ইত্যাদি হ্রাস পাবে ।
২. জাল ভোট বা প্রশাষনের পক্ষপাতিত্বের প্রভাব কমে যাবে। প্রথম পর্যায়ের দল ভিত্তিক নির্বাচনে প্রতি আসনের জন্য প্রয়োজন হবে লক্ষাধিক ভোট। জাল ভোট বা প্রশাষনের পক্ষপাতিত্বের কারনে সর্বাধিক দু-একটি আসন এদিক সেদিক হলেও হতে পারে, কিন্তু ফলাফল সম্পুর্ণ বদলে দেয়া সম্ভব হবে না।
৩. রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা কর্মীদের মাঝে দুরত্ব হ্রাস পাবে যা স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশের জন্য খুবই জরুরী। কারণ দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে শুধুমাত্র নিজ দলীয় কর্মী সমর্থকদের ভোটই যথেস্ট হবে না বরং ভিন্নমতের লোকদের ভোটও প্রয়োজন হবে। ফলে সবার কাছে সর্বাধিক গ্রহনযোগ্য ব্যাক্তিই নির্বাচিত হবেন ।

৪. দ্বীতিয় পর্যয়ের নির্বাচনে একই দল একই এলাকায় বহু প্রার্থি মনোনয়ন দিতে পারবে। ফলে নমিনেশন না পেয়ে বিদ্রহী প্রার্থি হিসেবে নির্বাচন করা, নির্বাচনের আগে ডিগবাজী দিয়ে অন্যদলে গিয়ে প্রার্থি হওয়া, কাল টাকার দাপটে মনোনয়ন কিনে নেয়া ইত্যাদি কলুষিত অধ্যায়ের অবসান হবে। আর দলও দেশপ্রেমিক, ত্যাগী নেতাদের মনোনয়ন দিতে পারবে, কারণ তাদের আসন হারানোর ভয় থাকবে না।

৫. দেশের সকল নাগরিকের মতামত সমভাবে মুল্যায়িত হবে। ভোটারদের ভোট নস্ট হওয়ার ভয়ে নিজ মতের বিপরীতে কোন দলকে ভোট দিতে হবে না।

৬. দেশের সকল এলাকায় সরকারী দলের প্রতিনিধি থাকবে। ফলে এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারে কোন পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। আর অধিকাংশ এলাকায় বিরোধী দলীয় প্রতিনিধি থাকার ফলে একটা চেক এন্ড ব্যলান্সের ব্যাবস্থাহবে।

আরো কিছু জরুরী সংস্কার প্রস্তাবঃ

১. সংসদ সদস্যদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা

বর্তমানে কোন রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের স্বাধীন ভাবে কোন প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার সুযোগ নেই। দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেই আইন অনুযায়ী তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। এটা নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের জন্য খুবই অপমানজনক (আব্দুল্লাহ আবুসায়ীদের মতে এরা হল দলীয় ক্রীতদাস)। এই আইন করা হয়েছিল সরকারের স্থিতিশীলতার জন্য। যাতে করে সংসদ সদস্যরা টাকা বা অন্য কিছুর বিনিময়ে বিক্রি হয়ে না যায়। কাজেই এই আইন একেবারে বাতিল করে দেয়াও উচিৎ নয়। তবে একে এ'ভাবে সংশোধন করা যায়- স্বধারণ ভাবে সকল সংসদ সদস্যের জন্য যেকোন প্রস্তবের ব্যাপারে স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ এবং ভোট দেয়ার অধিকার থাকবে। তবে কোন বিশেষ প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কোন দল যদি মনে করে যে তাদের সদস্যদের ভুল সিদ্ধান্ত দলের জন্য খুব বেশী ক্ষতিকর হবে, তাহলে ঐ বিষয়ে ভোট গ্রহনের পুর্বে তারা স্পিকারের কছে লিখিত নোটিশ দিতে পারবে। তখন স্পিকার রুলিং দেবেন যে, এই প্রস্তাবের উপর অমুক দলের সদস্যরা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে পারবেন না। ফলে অনাস্থা বা বাজেটেরমত স্পর্শকাতর বিষয়ে দল তার সদস্যদের নিয়ন্ত্রন করতে পারবে এবং অন্য সকল বিষয়ে সংসদ সদস্যরা স্বাধীনভাবে নিজের মতামত উপস্থাপ করতে পারবে।

২. রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন

এ'ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন কিছু উদ্যোগ নিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এর কারণ রেজিস্ট্রেশন প্রকৃয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোকে তেমন কোন সুবিধা (Benefit) দেয়া হয়নি যা তাদের উৎসাহিত করতে পারে। আমি প্রস্তাব করছি, রেজিস্ট্রেশনের বিনিময়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে সংসদে স্থায়ী সদস্যপদ দেয়ার ব্যাবস্থা করা হোক। প্রতিটা দল তাদের রেজিস্ট্রার্ড কর্মীর অনুপাতে জাতীয় সংসদে নির্দিস্ট সংখ্যক স্থায়ী আসন লাভ করবে। এটা হতে পারে প্রতি দুই লাখ রেজিস্ট্রার্ড কর্মীর জন্য একটি বা অন্য যেকোন অনুপাত। এই সদস্যরা দলের পক্ষথেকে মনোনিত হবেন এবং সরকার গঠনসহ নির্বাচিত সদস্যদেরমত সব ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা পাবেন।

৩. রাজনৈতিক কর্মী রেজিস্ট্রেশন

রাজনৈতিক দলরে পাশাপাশি কর্মীদেরও রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার আওতায় আনতে হবে। এ'জন্য নির্বাচন কমিশনের স্থায়ী অফিস করতে হবে প্রতি থানায়। ভোটাধিকার প্রপ্ত বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক এসব অফিস থেকে যেকোন রেজিস্টার্ড রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। এজন্য তাকে বার্ষীক একটা নির্দস্ট হারে রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হবে। এটা হতে পারে ১০০ টাকা বা অন্য যেকোন অংক। প্রতি বছর এই ফি দিয়ে এবং নিজে নির্বাচন কমিশনের অফিসে এসে রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করতে হবে। বছরের একটা নির্দস্ট সময়ে হিসেব করা হবে কোন দলের সক্রীয় (নির্দস্ট সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন নবায়নকৃত) কর্মী কত এবং সেই সংখ্যা অনুপাতে সংসদের স্থায়ী আসন সংখ্যা পুঃননির্ধারন করা হবে।

রেজিস্ট্রেশন করার বিনিময়ে রাজনৈতিক কর্মীদেরও কিছু সুবিধা দিতে হবে। নির্বাচন কমিশন থেকে রেজিস্টার্ড কর্মীদের ছবিসহ আইডি কার্ড দেয়া হবে যা জাতীয়তার সনদ হিসেবে গ্রহনযোগ্য হবে। এ'ছাড়া যেকোন সামাজিক কার্যক্রমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অংশগ্রহনের সুযোগ দেয়া হবে। জাতীয় বা স্থানীয় যেকোন নির্বাচনে কোন দল থেকে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য অন্তত পাচ বছর ঐ দলের রেজিস্টার্ড কর্মী থাকা বাধ্যতামুলক করা হবে।

৪. নির্বাচন কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানই সম্পুর্ন স্বাধীন হতে পারে না। রাজনৈতিক কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রীয়া চালু করা হলে সকল রাজনৈতিক দল মিলে অন্তত এক কোটি কর্মী রেজিস্ট্রেশন করবে যা থেকে কমিশনের বার্ষীক আয় হবে ১০০ কোটি টাকা। আশা করা যায় এরপর নির্বাচন কমিশনকে আর টাকার জন্য সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না।

৫. রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের সব বাজনৈতিক দল গনতন্ত্রের কথা বললেও দু'একটি ছাড়া প্রায় কোন দলের মধ্যেই গনতন্ত্রের চর্চা নেই। এ'ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকেই ব্যাবস্থা নিতে হবে। প্রতিটা দলকে নিজেদের গঠনতন্ত্র অনুসারে নির্ধারিত সময় পরপর দলের মধ্যে নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে যা সরাসরি নির্বাচন কমিশনের তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে। দলীয় কর্মীদের নির্বাচন কমিশন অফিসে এসে আইডি কার্ড দেখিয়ে নিজ দলের নেতা নির্বাচনের জন্য ভোট দিতে হবে। দেশের সকল থানায় কমিশনের স্থায়ী অফিস থাকলে এ'ধরনের নির্বাচন আয়োজন করা মোটেই কঠিন হবে না।

৬. অরাজনৈতিক প্রতিনিধি

বর্তমানে রাজনৈতিক দলের পরিচয় ও নিয়ন্ত্রন ছাড়া সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার কোন সুযোগ নেই। আর এই নিয়ন্ত্রনও এতো কড়া যে দলের বিরুদ্ধে কোন কথা বললেই সদস্যপদ হারাতে হয়। এই কড়া নিয়ন্ত্রনের বাইরে এমন কিছু প্রতিনিধি সংসদে থাকা উচিত যারা নিরপেক্ষ না হলেও অন্তত নির্দলীয়ভাবে জনগনের কথা সংসদে তুলে ধরতে পারবেন। এ'ধরনের প্রতিনিধির একটা উৎস হতে পারে পেশাজীবি সংগঠনগুল। আমাদের দেশে বেশকয়েকটি প্রভাবশালী পেশাজীবি সংগঠন আছে। যেমন ইঞ্জিনিয়ারদের আই.ই.বি (Institution of Engineers Bangladesh), ডাক্তারদের BMA (Bangladesh Madical Association)। এ'ছাড়া আইনজীবি, সাংবাদিক, শিক্ষক, কৃষিবিদ, আই.সি.টি, ব্যাংকার, ব্যাবসায়ীসহ আরও অনেক পেশাজীবিদের সংগঠন আছে। এ'সকল সংগঠনকে একটা নীতিমালার আওতায় আনতে হবে যেখানে বলা থাকবে ঠিক কি কি বৈশিস্ট থাকলে একটা সংগঠন থেকে সংসদে প্রতিনিধিত্ব করা যাবে। তবে দুটি বৈশিস্ট অবশ্যই থাকতে হবে-

এক. দল-মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিষেশে শুধুমাত্র পেশাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সদস্যপদ লাভের সুযোগ

দুই. সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া।

এই প্রস্তাবনার আরোকিছু গুরুত্বপূর্ন দিক (পাঠকদের পরামর্শে সংযুক্ত)

১. নারী প্রতিনিধিত্ব

সংসদে সম্মান জনক নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এখনও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে যে ব্যাবস্থা আছে তা যেমন নারীদের জন্য অসম্মানজনক তেমনি সরাসরী নির্বাচনের যে দাবি জানান হচ্ছে তাও গনতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থি। কারণ ৪৫টি আসনে সরাসরি নির্বাচন করলে প্রত্যেকের নির্বাচনী এলাকা হবে সাধারন সংসদ সদস্যদের এলাকার চেয়ে ৬ গুনেরও বেশী। অথচ তাদের ক্ষমতা ও গুরুত্ব থাকবে অন্যদের সমান।

আমি যে নির্বাচন ব্যাবস্থার কথা বলছি তাতে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি দল কমপক্ষে তিনজন প্রার্থী নিয়ে প্যানেল ঘোষনা করবে। আমরা এখানে একজন নারী প্রর্থী রাখা বাধ্যতামুলক করতে পারি। তাহলে দ্বিতীয় পার্যায়ে সারাদেশে যে ৩০০ প্যানেল হবে (সরকারী ও বিরোধী মিলে) তাতে ৩০০ নারী প্রর্থী থাকবে। আশা করা যায় সেখান থেকে ৩০-৪০ জন নারী নির্বাচিত হয়ে আসতে পারবে। তাছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহনের ফলে দলের মধ্যেও তাদের অবস্থান সংহত হবে যা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য খুই জরুরী।

২. উপনির্বাচন

আমাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্দলীয় তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। কিন্তু উপনির্বাচন করতে হয় দলীয় সরকারকে এবং প্রায় সব সময় এই উপনির্বাচন নিয়ে সরকারী দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে। সরকার যদি প্রত্যক্ষভাবে পক্ষপাতিত্ব নাও করে, তাহলেও পরোক্ষ কিছু সুবিধা তারা পাবেই। আর ভোটারগনও এলাকায়

সরকারী এম.পি. পাওয়ার আশায় সরকারী দলের প্রার্থীর প্রতি দুর্বল থাকতে পারে। ঠিক যে কারনে তত্বাবধায়ক সরকারের আবির্ভাব সেই কারণেই কোন উপনির্বাচন কখনই সম্পুর্ন নিরপেক্ষ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

আমার প্রস্তাবনায় এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান পাওয়া সম্ভব। আমি বলেছি দ্বিতীয় পর্জায়ের ব্যাক্তি কেন্দ্রীক নির্বাচনে এলাকায় একই দলের একাধীক প্রর্থী অংশ নেবে। প্রথম জন সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবেন। তাহলে তার অনুপস্থিতি বা অক্ষমতায় দ্বীতিয় জনকে সংসদে পাঠান যেতে পারে। যেহেতু উভয়ে একই দলের প্রার্থী সেহেতু অন্য কেন সমস্যা হওয়ার কথা নয় বরং এই ব্যাবস্থার মাধ্যমে আমরা উপনির্বাচনে প্রয়োজনীয়তাই শেষ করে দিতে পারব। আর যদি আমরা উপনির্বাচনের ব্যাবস্থা রাখতেই চাই তাহলে সেখানে প্রতিদ্বন্দিতা করবে একই দলের একাধিক প্রার্থী। তাই কোন দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের সুযোগই থাকবে না।

৩. রাজনৈতিক দলসমুহের সুবিধা

যেহেতু রাজনৈতিক বিধান বাস্তবায়নের প্রধান উপকরণ রাজনৈতিক দল সেহেতু এই প্রস্তাবনার মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুল কি কি সুবিধা পাবে তা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। জন মর্থনের দিক থেকে আমাদের প্রধান দল মাত্র দুটি। বাকি ছোটদলগুলো সংসদে যাওয়ার জন্য এই দুই দলের উপর নির্ভরশীল। অথচ নির্বাচনপুর্ব জোট গঠন প্রকৃয়ায় এই দুই দলকেই সর্বাধিক মুল্য দিতে হয়। যেসব দল আলাদাভাবে নির্বাচন করলে দুই-তিনটির বেশি আসন পাবে না, তাদের জন্য ছেড়ে দিতে হয় ৫০-৬০ টি এলাকা। নির্বাচনের আগে তো নয়ই পরেও কোন দলের জনপ্রীয়তা মাপা সম্ভব নয়, কারণ তারা যে ভোট পেয়েছে তার কতটি নিজ যোগ্যতায় আর কতটি শরীকদের অবদান তা আলাদা করা অসম্ভব।

স্বাধরণ দৃস্টিতে জোট গঠনের সুফলগুলো বেশি দেখাগেলেও এর কিছু মারাত্মক কুফলও আছে। যেমন বিদ্রহী প্রার্থী। আগামী নির্বাচনে উভয় জোটকে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করতে হবে, তা'হচ্ছে এই বিদ্রহী প্রার্থীদের নিয়ন্ত্রন করা। এতে দলের প্রতি সমর্থন কমে যাওয়াও আশংকা তৈরী হয়। করণ এমন অনেক ভোটার থাকেন যারা মুল দলকে পছন্দ করলেও শরিক হিসেবে যেই দলের প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হয়েছে সেই দলকে পছন্দ করেন না। তা'ছাড়া কোন একটা এলাকা যদি প্রতি নির্বাচনে শরিকদের জন্য ছেড়ে দিতে হয়, তা'হলে ঐ এলাকায় দলীয় অবস্থান ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকে। সেখানে যোগ্য নেতা-কর্মী তৈরী হওয়ার সুযোগ থাকে না। ফলে পরবর্তীতে কখন জোট ভেঙ্গে গেলেও ঐ এলাকায় নির্বাচন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ছোট দলগুলোকেও জোট গঠন করতে গিয়ে চরম মুল্য দিতে হয়। নিজেদের আদর্শ, কর্মসুচি তো বটেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতীক পর্যন্ত বিশর্জন দিতে হয়। আর এ'ভাবে সংসদে গিয়ে কি তারা নিজেদের কথা বলতে পারে? মোটেই না, বরং মুল দলের সব অপকর্মের দায় দ্বায়িত্ব বহন করতে হয়। আর আলাদা ভাবে নির্বাচন করে এরা যত ভাল প্রার্থীই মনোনয়ন দিক না কেন ভোটাররা কেবলমাত্র সম্ভাব্য বিজয়ীকেই ভোট দেয়। কাজেই প্রচলিত ব্যাবস্থায় ছোট দলগুলোর জন্য দুটি মাত্র পথ খোলা: হয় কোন বড় দলের সাথে মিশে যাও না হয় বিলুপ্তির জন্য তৈরী হও।

প্রস্তাবিত নতুন ব্যাবস্থায় উভয় শ্রেনীর দলের জন্যই সম্মান জনক সমাধানের ব্যাবস্থা আছে। প্রাথমিক দল ভিত্তিক নির্বাচনের সময় কোন জোট গঠনের প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক দল তার নেতা কর্মীদেও নিয়ে নিজ নিজ নীতি, আদর্শ, কর্শবুচীর প্রচারনা চালাবে সারা দেশে। ভোটাররাও বিভিন্ন দলের নীতি-আদর্শ-কর্মসুচী দেখে ভোট দেবে। ভোট নস্ট হওয়ার ভয়, এলাকায় সরকারী এম.পি. না থাকার ভয় তাদের প্রভাবিত করতে পারবে না। এই পর্যায়ের নির্বাচনের পর কার জনপ্রিয়তা কতটুকু তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। বড় দলগুলো তখন শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় দলগুলোকে নিয়েই সরকার গঠন করতে পারবে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে সরকারী ও বিরোধী উভয় জোট সারা দেশে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একাধিক প্রার্থী নিয়ে নির্বাচন করবে। ফলে তাদের বিদ্রহী প্রার্থী নিয়েও চিন্তা করতে হবে না আবার কোন এলাকায় দলীয় অবস্থান হারানোর ভয়ও থাকবে না। আর ছোট দলগুও এই ব্যাবস্থায় সারা দেশ থেকে মাত্র ১% ভোট আদায় করতে পারলেই নিজেদের আদর্শ ও পরিচিতিসহ সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে।

(নাঈম হাসান)

E-mail: nhasanbd@yahoo.com

Discussion Group: http://groups.yahoo.com/group/mfgg/

সচেতন সুশীল সমাজের কাছে আবেদন:

১. অনুগ্রহ করে এই প্রস্তাবনার মুল বক্তব্য অনুধাবনের চেস্টা করুন।

২. আপনার পরিচিতজনের সাথে এ'ব্যাপারে কথা বলুন।

৩.পৃন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে এ'সম্পর্কে আপনাদের মুল্যবান মতামত জনসাধারনের সামনে তুলেধরুন।

৪.এই প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য সামর্থ অনুযায়ী চেস্টা করুন এবং অন্যকেও উৎসাহিত করুন।